প্রথম আলো

তারিখ 06 APR 2014
পৃষ্ঠা ১০ ... ৭

শিক্ষাঙ্গন ■ মো. আবু সালেহ সেকেন্দার

ছাত্রলীগ কি আইনের উর্ধ্বে?

ছাত্রলীগের এক শ্রেণীর নেতা-কর্মীর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। সম্প্রতি তাঁদের বেপরোয়া তৎপরতায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ও জনপ্রিয় শিক্ষার্থী সায়াদকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। ওই ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নেতা রুস্তম নিহত হয়েছেন। অভিযোগের তির শিবিরের দিকে থাকলেও ছাত্রলীগের হলের কমিটি গঠনকেন্দ্রিক অভ্যন্তরীণ কোন্দলের বিষয়টিও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আগেও ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থী নিহত হওয়ার সঙ্গে ছাত্রলীগের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু ওই সব ঘটনায় জড়িত অপরাধীদের শাস্তি হয়নি; বরং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের মতো বহু শিক্ষক এখনো সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেন বলে অভিযোগ আছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবায়েরের হত্যাকারী ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলাকারীদের সঙ্গেও প্রক্টরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। প্রক্টরের কাজ ছাত্রদের সন্ত্রাসী কাজ থেকে বিরত রাখা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা সেই দায়িত্ব পালন করেন না। ক্যাম্পাসে হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্ত্রাসীরা শাস্তি না পাওয়ায় অন্যরাও ওই কাজে উৎসাহিত হচ্ছেন।

মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর গ্রন্থের মতে, (স্বাধীনতার পর) দুষ্কৃতকারীদের ধরলেই বলা হতো, ও আমাদের লোক, ও আমাদের ছাত্রলীগের লোক, ও আমাদের দল করত, আমাদের ভোট দিয়েছে—এসব বিবেচনায় দুষ্কৃতকারীদের ছেড়ে দেওয়া হতো। ফলে আইন হয়ে পড়েছিল দুর্বল' (পৃ. ১৪১)। এখনো ওই সব বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অপরাধীদের ছেড়ে দেওয়া হয়। বিশ্বজিৎ হত্যাকাণ্ডে জড়িত শাকিল-নাহিদদের নিম্ন আদালতে ফাঁসির আদেশ হলেও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থী হত্যার দায়ে সাম্প্রতিক সময়ে কোনো ছাত্রনেতারই শাস্তি হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আবুবকর নিহত হওয়ার চার বছর পার হলেও ওই ঘটনায় জড়িত কারও বিচার হয়নি; বরং পরে অনেক সন্ত্রাসীকে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার গুরুত্বপূর্ণ পদ, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, প্রথম শ্রেণীর চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রুয়েট, ঢামেকসহ ছাত্রলীগের অভিযুক্ত নেতা-কর্মীদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

দুই

বাংলাদেশে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময়ের মতো এখনো যে সরকার ক্ষমতায় থাকে, ক্যাম্পাস ওই সরকার-সমর্থিত ছাত্রসংগঠনের দখলে থাকে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা অসহায়। হলের টর্চার সেলে ডেকে নিয়ে নির্যাতন করা হয়। ছাত্র সংসদগুলো সক্রিয় থাকার সময় ভোটের প্রয়োজনে ছাত্রনেতাদের সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে জবাবদিহি করতে হতো। কিন্তু এখন ছাত্র সংসদগুলো সক্রিয় না থাকায় ওই জবাবদিহির সুযোগও নেই। ফলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে অধিকাংশ ছাত্রনেতা আর সাহায্যকারী নন, সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো ভীতিকর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব শিক্ষার্থীকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা হলেও অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েই সন্ত্রাসী হয়ে ওঠেন। সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং এক শ্রেণীর শিক্ষকের প্রশ্রয়ে এমনটি ঘটছে। দলবাজ শিক্ষকদের প্রশ্রয়ে বড় ভাইদের ক্যাম্পাসে অপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়ার অসংখ্য উদাহরণই সদ্য ক্যাম্পাসে পা রাখা একজন শিক্ষার্থীকে অপরাধে জড়াতে উৎসাহিত করে। ক্যাম্পাস ক্যানটিনে অন্যদের টাকা দিয়ে খাবার না জুটলেও ওই সন্ত্রাসী বিনা টাকায় জামাই-আদরে খেতে পারে।

সন্ত্রাসী ছাত্রনেতাদের বিচার না হওয়াও মেধাবীদের সন্ত্রাসের পথে পা বাড়াতে উৎসাহিত করছে। এ কথা ঠিক, কোনো ঘটনা ঘটার পর প্রশাসন ওই ঘটনায় জড়িত সন্ত্রাসীদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক অথবা স্থায়ী বহিষ্কার করে। তবে 'কাজির গরু কেতাবে আছে, গোয়ালে নেই' প্রবাদের মতো ওই বহিষ্কার হয় কেবল কাগজ-কলমে। বাস্তবে তাঁরা আগের মতোই ক্যাম্পাসে দাপিয়ে বেড়ান।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় বহিষ্কৃত ছাত্রনেতা শুধু নিয়মিত ক্যাম্পাসে আড্ডা দেন না, সম্প্রতি তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের উপস্থাপনার দায়িত্বও পালন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এস এম হলের এক বহিষ্কৃত সভাপতি নিয়মিত হলে রাত্রিযাপন করলেও প্রশাসন ওই বহিষ্কৃত নেতাকে হল থেকে বের করতে পারেনি। বরং ওই বহিষ্কৃত নেতা মধ্যরাতে মাতাল হয়ে এক শিক্ষার্থীকে কুপিয়ে জখম করলেও তাঁর বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

সন্ত্রাসী ছাত্রনেতাদের সংগঠন, হল বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হলেও অদৃশ্য কারণে কিছুদিন পর ওই বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করার ঘটনাও অহরহ ঘটছে। সংগঠন থেকে বহিষ্কার হলে তো কথাই নেই। বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহারের পাশাপাশি বড় পদ দিয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করার বহু উদাহরণও রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতা ও ছাত্রসংগঠনের শীর্ষ নেতাদের প্রশ্রয়ই ক্যাম্পাসগুলোকে সন্ত্রাসীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করছে।

ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে মূল দায়িত্ব পালন করতে হবে। অপরাধ যতই নগণ্য হোক, কোনো চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে অপরাধীকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। 'ওরা আমাদের ছেলে' অজুহাতে সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দেওয়া বন্ধ করতে হবে। প্রয়োজনে ওই সব সন্ত্রাসীকে পুলিশে সোপর্দ করা যেতে পারে। হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বাংলাদেশের প্রচলিত ফৌজদারি আইনে বিচার হওয়াই স্বাভাবিক হলেও এখন পর্যন্ত অদৃশ্য কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে ওই আইনের প্রয়োগ বিরল। এখন থেকে ক্যাম্পাসের সন্ত্রাসীদেরও প্রচলিত আইনে বিচার করতে হবে। পরিশেষে, আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে 'সন্ত্রাসী ছাত্রনেতারাও আইনের উর্ধ্বে নয়' প্রমাণই ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে পারে।

● মো. আবু সালেহ সেকেন্দার : শিক্ষক ও ইতিহাস গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।
salah.sakender@gmail.com